এবং ওরা

তুষার চট্টোপাধ্যায়

(এক)

'নমস্কার। আপনি এসেছেন শুনেছি। তাই এলাম আমাদের এই ছোট্ট রেল স্টেশনের মাস্টারবাবুর সঙ্গে পরিচয় করতে।'...

আমি হঠাৎ করে এমন একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না এই কিছুক্ষণ হ'ল, মানে দুপুরের ট্রেনেই এখানে এসেছি। ভেবেছিলাম দুপুরটা জমিয়ে ঘুমিয়ে নেব। বিকেলে উঠে স্টেশনে যাওয়া যাবে। চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখা যাবে। কিন্তু ঘুম আসছিল না। জায়গাটা ভাল না। রাজ্যের বদখৎ মানুষ এখানে এসে জড়ো হয়েছে। স্টেশনটা ছোট হলে কী হবে, এখানকার চাকরিটা সুখের কিংবা শান্তির হবে না। বারান্দায় বসেছিলাম বেতের চেয়ারটায়। বসে বসে এসব কথাই ভাবছিলাম। এখানে আসবার আগে অনেকে আমাকে এ জায়গাটা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনিয়ে, সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বড় বাজে জায়গা। বাংলাদেশের বর্ডার দু'কিলোমিটারের পথ। বাংলাদেশ থেকে বিদেশি মালপত্র আসতে চোরা পথ ধরে এ দেশের মালপত্র বাংলাদেশে যাচ্ছে। পুলিশ আছে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আছে এসব কিছু দেখার জন্যে। কেউ বুঝতে পারে না এত শত সরকারি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দু'দেশের মালপত্তরে দু'দেশের বাজার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে! পুলিশ দেখছে ঠিকই। ওরা ওদের মাসোহারাটা পেলেই আর কিছু বলতে যায় না। ওরা আছে বলেই স্মাগলারদের রাজ রাজত্ব। দ'হাতে টাকা, মদ। সন্ধ্যে হলেই আর কথা নেই। কোথা থেকে যেন মেয়ে ফেয়েও জুটে যায় ওদের ভোগে। রাতভর স্টেশনে এবং স্টেশন এলাকায় শান্তিতে থাকার উপায় নেই। মদ আর জুয়ার হারা - জেতা নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি, বন্য উল্লাস। হৈ চৈ চেঁচামেচি। মারদাঙ্গায় রাতের নিউ গিতালদহ পূর্ণ যৌবন ফিরে পায়। ওখানকার দিনটাকে মনে হয় রাতেরই একটা সময়, আর রাতটাকে মনে হয় দিন। ...ভদ্রলোক কিংবা সুস্থ সংস্কৃতিপ্রেমী রুচিশীল কোনও মানুষের এখানে না আসাই উচিৎ। এলেও ভদ্রভাবেই, মানে কোনও অন্যায়েরই প্রতিবাদ না করে দিন কাটিয়ে চলে যেতে হবে। টুঁ শব্দটিও নয়। এখানকার স্টেশন মাস্টার এবং অন্যান্য স্টাফরা এই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের হাতের পুতুল। কোনও রকম বিরোধিতায় নিজেকে না জড়িয়ে এদের ইচ্ছেয় কাজ করে যাও। তা হলে আর কোনও বিপত্তি নেই। সুখ অসুখের কিংবা শান্তি অশান্তির লড়াইটাও থাকবে না। এসব নিয়ে বিচিত্র সব গল্প শুনেছি, ইতিপূর্বে এখানে কাজ করে চলে যাওয়া সহকর্মীদের কাছে। আমি বসে বসে দেখছিলাম স্টেশনের পিছনে পঞ্চাশ ষাটটা নানান পণ্য সামগ্রীর ছোট বড় শ্রীহীন দোকান। প্রায় সব দোকানেই টেপরেকর্ডারে চটকদারি হালকা অর্থবহ হিন্দি গান ক্লান্তিহীন বেজেই চলেছে। কিন্তু কোনও গানই শোনা যাচ্ছে না ঠিক ঠিক মতো। শুধু গগন ফাটানো শব্দ ঝংকার। যন্ত্রণাদায়ক নানান ঢঙের শব্দের যোগফলে এলাকাটা বিচিত্র এক রূপ নিয়েছে। বসে বসে এসব নিয়েই একান্ত হয়ে ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম এইতো আর কয়েক ঘন্টা পরেই এখানকার নিউ গিতালদহ অন্য আর একটা নিউ গিতালহদ হয়ে যাবে। সেই 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস' অথবা 'টোকিও'। বসে বসে ভাবছিলাম আর বাইরে বেরিয়ে পড়া প্রতিক্রিয়াহীন আতঙ্কে ভিতরে ভিতরে আঁতকে উঠছিলাম। এতো দিনের শোনা গল্পগুলোর বাস্তব রূপ আজ আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। শুধু আজই বলছি কেন, এখানে তো আমাকে অনেক দিনই থাকতে হবে। অল্প কয়েকটা দিনের জন্য তো আমার এখানে আসা নয়। সুতরাং এখান থেকে চলে যাবার দিন পর্যন্তই দেখতে হবে।...

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হাত জোড় করে তাকালাম ছেলেটির দিকে। ছেলেটি? হ্যাঁ, ছেলেটিই তো! আমি কিছুতেই সামনে এসে দাঁড়ানো আগন্তুককে ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি বয়সের ভাবতে পারি না। বেশ শক্ত সমর্থ তরতাজা, প্রাণবন্ত অবয়বের। ছেলেটি হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আমি অশোকপ্রিয়দর্শী বর্মন। আমার বাড়ি দিনহাটা। কিন্তু থাকি এখানেই। এই নিউ গিতালদহেই।

আমি তো এখানকার ছেলেদের গল্প আগেই শুনে এসেছি। তো আমি সন্তর্পণে এগোই, 'বাড়ি দিনহাটা অথচ এখানেই থাকেন! বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বলুন অশোকবাবু।'

ও আসলে অশোক প্রিয়দর্শী, ও শুধুই অশোকপ্রিয় নয়। আমার ভুলটা ধরিয়ে দিল অশোক। হ্যাঁ, আমারই শুনতে ভুল হযেছিল। অশোক প্রিয়দর্শী বর্মন আমার ভুল হওয়াতে না হেসে পারল না। বলল, 'এখানে যৎসামান্য ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে পড়ে আছি। এ ছাড়া উপায় কী বলুন। চাকরি বাকরির যা অবস্থা। অনেক ভেবে চাকরির পেছনে না দৌড়ে স্বল্প পুঁজির এই ব্যাবসাটাই ধরে নিলাম।'

আমি কথা বাড়াই না। আলতো করে উচ্চারণ করি, 'অ'।

অশোকপ্রিয়দর্শী বলল, 'এখানে আমাকে সবাই চেনে। আপনি এখানে নতুন। যখন যে রকমের দরকার হবে এই অশোককে ডেকে পাঠাবেন। কোনও অসুবিধা হবে না।'

আমি সংক্ষেপে বললাম, 'আপনার কথা নিশ্চয় মনে থাকবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, অশোক বলল, 'আজ এই অব্দিই, পরে আবার একদিন এসে যাব, গল্প হবে।'

অশোক ফিরে যেতে গিয়ে আবারও ফিরে আসে, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনার খাওয়া দাওয়া? রান্নাবান্না করার অভ্যেস আছে, নাকি হোটেল ফোটেলেই চালিয়ে নেবেন ঠিক করেছেন?'

আমি বললাম, 'না রান্নাবান্নায় যাবো না। এখানকার কোনও স্টাফকে বলে দেব, ওরাই ওদের ঘরে রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে করে দু'বেলা দিয়ে যাবে।'

'না হলে আমি আছি আপনার সেবায়।' একটু থেমে অনুনয় করে বলল, 'আপনারা না খেলে আমি কাদের নিয়ে ব্যবসাটা করব? আমার হোটেলের নাম 'নির্মল হৃদয়'।'

(দুই)

অশোক আমার খুব কাছের মানুষ হতে বেশি সময় নেয়নি। কথায় কথায় ও ওর কবিতা লেখার গল্পটা শুনিয়েছে। আমি অবাক না হয়ে পারি না। সীমান্তের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বাজারে একজন ভাত বিক্রেতা কবিতা লেখার কথাটাও ভাবতে পারে! ও বলেছে, দু'তিনটে খাতা নাকি ভর্তি হয়ে গেছে ছোট বড় কবিতায়। কিন্তু কোথাও ছাপা হয়নি। পড়ে শোনাবে যে, এখানে তেমন কোনো সমঝদার লোকই নেই। এসব নিয়ে দেখলাম অশোকপ্রিয়দর্শীর দুঃখ আছে, বুক ভর্তি অভিমান আছে। আমাকে ও ওর কবিতার খাতাগুলো পড়াতে পেরে খুবই খুশি। আমি ওর কবিতার প্রথম পাঠক। ও ওর কবিতায় বিপ্লবের ডাক দিয়েছে, সুন্দরের ছবি এঁকেছে, আবার কোনো কোনো কবিতায় যুবতীর ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছে। ওর এক জোড়া জুল জুল অন্বেষা চাউনি ভর্তি চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছি, 'আপনি অনেক দিন যাবৎ লিখছেন, না?

—আপনি এভাবে 'আপনি আজ্ঞে' করলে আমার ভাল লাগে কী করে বলুন তো?

— না না, সেটা তো ঠিকই, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি নয় তুমি। তা কাব্য চর্চাটার বয়স কত? অনেক দিন?

—হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন? আমার কবিতা পড়ে আপনার সেরকমটাই মনে হয়েছে? মনে হচ্ছে আমি অনেক দিনের লিখিয়ে?

আমি খুশি হতে পারার অভিব্যক্তি চোখমুখের আদলে ভাসিয়ে তুলে বললাম, 'তুমি তো বেশ ভালই লিখেছো।'

অশোক নিজের প্রশংসা শুনে বিব্রত বোধ করে। বলল, 'না না, ওভাবে বলবেন না। আমার কবিতাগুলো কবিতা হচ্ছে না। সেটা আমি বুঝি। তবু একটু আনন্দের মধ্যে থাকার জন্যই লেখা। এসব লেখাকে ভাল লেখা বলে না।'...

এর পরে ও আমাকে নিউ গিতালদহের সুশান্ত, মনীশ, গগন এবং আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সুশান্ত ইশোর কাটা কাপড়ের বিজনেস করে। গিতালদহের বাংলাদেশের বর্ডার থেকে গাঁট গাঁট রেডিমেড জামা প্যান্ট নিয়ে যায় আলিপুরদুয়ার - কোচবিহারে। ওখানকার বাজারে উল্টোপাল্টা দামে বিক্রি করে। ওখান থেকে আবার আশেপাশের বাজারগুলোয় চালান করে আরও বেশি মুনাফার জন্য। সবাই বলে এসব করে সুশান্ত অনেক পয়সা করেছে। পুলিশও ওর হাতের মুঠোয়। কিন্তু সুশান্ত ছেলেটা বড্ড বাজে প্রকৃতির। মারকুটে, সকাল সন্ধ্যা আকণ্ঠ মদ গিলে থাকবে। কাজে গেলেই ভক ভক করে চোলাই - এর গন্ধ ভেসে আসবে ওর শরীর থেকে। দস্যুর মতো চেহারাটা বানিয়েছে। মাথা ভর্তি চুল। দু'গালে শিবাজী মার্কা চাপা দাড়ি। চাল চলনে হিন্দি সিনেমার সস্তার জনপ্রিয় ভিলেন। কথাটা মিথ্যে নয়। একদিন বামনহাটা থেকে ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়েছে, দেখি সুশান্ত এইয়া ভোমা ভোমা কাপড়ের গাঁট দুমদাম চড়াচ্ছে গাড়িতে! মানুষের গায়ে পড়ছে - না কোথায় পড়ছে সেদিকে সুশান্ত তাকাচ্ছেই না! পুলিশের লোকজন সুশান্তের থেকে সরে গিয়ে অনেকটা দূরে ভিখিরি ধরনের কিছু যাত্রীর ছোটখাটো পোটলা পুটলি খোঁচাখুচিতে ব্যস্ত। ওরা সুশান্তের কাছে যাবে না। এসব নিয়ে বেশ কয়েকবার সুশান্তের সঙ্গে ওদের মারদাঙ্গা করতে হয়েছে। এখন পুলিশের সঙ্গে ওর সমঝোতা হয়েছে। মাস্থলি সিস্টেমে কাজ হয়। পুলিশ ওর পকেটের লোক। তো সেদিন সুশান্তর অমন হেনস্থা হতে দেখে খুব খারাপ লেগেছে। তখনও সুশান্তকে চিনি না। পরে অশোক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'মাস্টারবাবু, এই ছেলেটির সঙ্গে মিশুন, দেখবেন ওর মতো ছেলে হয় না।' অশোকের সুপারিশ শুনে মনে মনে হেসেছিলাম, সুশান্ত কেমন ছেলে সেদিন তো সব কিছু আমি নিজে চোখেই দেখলাম। এখানে এসেছি, তোমাদের নিয়ে চলতে হবে। সুতরাং তোমরা সবাই ভাল। এ ছাড়া উপায় কী।

একদিন সুশান্ত এসে বলল, 'চলুন মাস্টারবাবু, আপনাকে পুরনো গিতালদহ স্টেশনটা দেখিয়ে আনি।'

পুরনো গিতালদহ স্টেশন এবং বাজারটায় বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটা আমার ছিলো। পুরনো গিতালদহ উঠে গেছে। পুরনো স্টেশন বিল্ডিং-এ এখন বি. এস. এফ. -এর ক্যাম্প। ওখান থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বাংলাদেশের মোগলহাট রেল স্টেশন দেখা যায়। দু'দেশের মধ্যে শুধু ধারলা নদীটা বয়ে চলেছে আপন ইচ্ছায় সুতরাং সুশান্তকে ফেরাতে পারিনি। সুযোগ বুঝে সুশান্তকে বললাম, 'শুনেছি তুমি লেখা পড়া জানা ছেলে, একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা না করে এসব বাজে কাজকর্মে এলে কেন? ভীষণ রিস্কি। এই ব্যবসায় তো মান সম্মানটাও নেই। তুমি তো অন্য ভাবেও জীবনটাকে দেখতে পারতে।'

ও বলল, 'একাত্তরে বি. এস. সি. পাশ করেছি। তারপর আর হয়নি। বাবা হাত উঁচিয়ে পড়েছে। এমনিতেই বাবার বড় সংসার। পাঁচটা বোন, আর আমরা দু'ভাই। আমিই বড়। বাবা দিনহাটা মহাকুমা হাসপাতালের স্টোরে অল্প বেতনের চাকুরে। এত বড় সংসার। তার মধ্যে আমার জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে কোনও দিন সুস্থ দেখিনি। বড় বড় সব অসুখ। বাবার ক্ষমতা ছিল না আমাদের খাইয়ে পড়িয়ে মার চিকিৎসাটা করায়। আমরা সাতটা ভাইবোন দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলাম। সংসার চালানোর খরচটা হু হু করে বেড়ে গেল। কিন্তু বাবার ইনকাম তো সে তুলনায় বাড়ল না। আমাকে পড়াতে গিয়ে মার গায়ে যা সামান্য ছিটে ফোঁটা সোনার গহনা ছিল, তা সবই চলে গেল পাড়ার যতীনকাকুর ঘরে। বোনদের পড়াশুনা বন্ধ। ভাইটা স্কুল ছেড়ে ঘরে এসে বসল। এ ছাড়া ওর পড়াশুনায় তেমন মনও ছল না। রাত দিন আজে বাজে আড্ডায় মশগুল হয়ে থাকত। বোনেদের বয়স বাড়ছে। ওদের পাত্রস্থ করার দরকার। একজন দু'জন তো নয়, পাঁচ পাঁচ জন। এমন একটা পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরতে, বাবার পাশে দাঁড়াতে আমি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি একটা চাকরির জন্য। ঐ সময়কার আমাদের রাজ্যের অবস্থাটার কথাটা মনে আছে তো? বাহাত্তরের অবস্থাটা? তো মালচিনি থেকে জিতে মন্ত্রী হয়েছে। সবাই বলল মানুষটি ভাল। গরিবের বন্ধু। ওকে ধরলেই নাকি চাকরির অভাব হবে না, ওর পি.এ.-র সঙ্গে কথা বলতে পরামর্শ দিলেন। পি.এ. বললেন, 'হয়ে যাবে। তবে কিছু খরচ খরচা করতে হবে।' কত জানতে চাইতেই পি.এ. বললেন, 'সবাই যতটা পারবে ততটা তুমি পারবে না। তোমার অবস্থায় কথাটা তো বিস্তারিত জেলা সেক্রেটারি নিশিবাবুর চিঠিতেই পড়লাম। কিন্তু খালি হাতে তো হবে না। দিনকালটা তো বুঝবে।' 'সেটা কত বলুন স্যার।' আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি আর একটুও সময় না নিয়ে বললেন, 'পঞ্চাশ নিয়ে এসো। ওতেই করিয়ে দেব। আমি আছি পাশে, ভয় নেই, টাকাটা জলে যাবে না।' মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার বাবা এক সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার টাকা কোনও দিন চোখেই দেখেননি।...এসব করছিলাম তখন। একে ধরছি, তাকে ধরছি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একে ধরে তাকে ধরে রাত করে বাড়ি ফিরছি। দেখতাম বাড়ির সকলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। আমার জন্য রাত জেগে বসে থাকার মানেটাই বাড়ির কেউ বুঝতে পারত না। বাড়ির সকলের মনের ভেতরটা আমি দেখতে পেতাম। বোনেদের মুখের দিকে তাকাতে

পারি না। মার দু'চোখে কেমন ব্যথাতুর চাউনি। বাবা কথাবার্তা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। একদিন রাত করে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বাইরে থেকে শুনি আমাকে নিয়ে বাবা মার মধ্যে কথা কাটাকাটি। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। বাবা বলছেন, 'সব কিছু খুইয়ে তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখালাম কি সারাজীবন ঘরে বসে খাওয়াবার জন্যে?' মা'র সরল প্রশ্ন, 'চাকরি না পেলে ওই বা কী করবে? যারা চাকরি দেবার মালিক তাদের খুন করবে?'

—রাজ্যর সব ছেলে চাকরি পেয়ে যায়, পায় না শুধু তোমার ছেলেই?

—পাচ্ছে তো না। দেখছোই তো। তোমার ছেলে চাকরি পাচ্ছে না। এখন তুমি ওকে কী করতে বল? গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলবে?

—মাটি কাটতে বল, রেল স্টেশনে মুটে খাটতে বল, চায়ের দোকানে কাপডিশ ধুতে বল। ও বাড়িতে ঢুকলে ওকে সাফ বলে দেবে আমি আর পারব না!...

বাবা চাপা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিলেন।'...

সুশান্ত এবার একটু থাকল। একটুক্ষণ পরে বলল, 'আমি সেই দিনই ভাল করে বুঝে গেলাম কালচিনির মন্ত্রী এবং আমদের বাড়িটা, কেউই আমার কেউ নয়। আমার চারদিকটা ভালবাসাহীন। বুঝে গেলাম পৃথিবীর কোথাও আমার জন্য সামান্যতম ভালবাসাও পড়ে নেই।' অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরাল সুশান্ত। আমায় একটা দিল। একমুখ ধোঁয়া মুখ চিতিয়ে হাওয়ায় ভাসাতে ভাসাতে বলল, 'ওই রাতে আর বাড়ি ঢুকিনি। তারপর এক বন্ধুর হাত ধরে এখানে। এই নিউ গিতালদহটা দু'দিনেই আমাকে কাছে টেনে নিল। আমিও গিতালদহকে ভালবেসে ফেললাম। প্রথমটা যা ভেবেছিলাম, পরে বুঝতে পারলাম আমার সব ভাবাভাবিই ভুল। এসব কাজে বিনয়ী হলে, মানে ভদ্রলোক হলে, ভদ্র হলে মার খেয়ে যেতে হবে। এখন আমার হুমকি হামকাতে কাজ হচ্ছে। কোনও কাজই আটকে থাকছে না। না হবার কাজটাও দেখছি হয়েই যাছে! বাবা আজ আর নেই। বাবার সংসার এখন আমার মাথায়। দু'বোনের বিয়ে দিয়েছি। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে খাসের জমিতে মাথা গোঁজার জায়গা করেছি। মাকে ডাক্তার দেখাচ্ছি। শুধু রতনটাকে নিয়েআমার যা চিন্তা। পড়াশুনা করে না। অনেক আজে বাজে বন্ধু জুটে গেছে। তাই ভাবছি ওকে স্কুল থেকে বার করে আনব। মাধ্যমিক পর্যন্ত হয়েছে। ওতেই হবে। এই তো বাবা আমাকে সব কিছু খুইয়ে বি.এস.সি. পাশ করাল, কী পেল বাবা মা? আমিই বা কী পেলাম? আর দেশ? একটা শিক্ষিত স্মাগলারের জন্ম হ'ল বই তো আর কিছু নয়! এই বর্ডারটায় বাংলাদেশ থেকে বিদেশি জামা প্যান্ট, সোনা, সাবান, রেপসীড, পাম অয়েল, রেডকাউ দুধ, ক্যারো প্রভৃতি আসে। আমাদের দেশ থেকে সাইকেল পার্টস, ওষুধ, বইপত্র, ম্যাগাজিন চড়া দামে পাচার হয়। ভাবছি রতনটাকে লাইনটা বুঝিয়ে দেব। ওর মাথার উপরে আমি যেখানে আছি, সেখানে রতনের আবার ক্যাপিটালের চিন্তা কিসের?'

আমি কথা ঘোরাতেই শুধোই, 'সুশান্ত, ভালবাসা তো পাওনি কখনও, কিন্তু জীবনে কাউকে ভালবাসনি তুমি?'

এবারে ও আমার প্রস্ন শুনে হো হো করে হেসে। হাসতে হাসতেই বলল, 'আপনি কিন্তু দারুন দারুণ সব প্রশ্ন করেন।' হাসির রেশ কিছুটা মিটিয়ে এনে বলল, 'হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না, আপনার কাছে লুকিয়ে রেখে কথা বললেই বা কী লাভ হবে। সে ধরনের একটা ব্যাপারও জীবনে এসেছিল। প্রার্থনা, আমাদের কলেজেই পড়ত, আমার দু'বছরের জুনিয়ার। ওকে নিয়ে সেই সময়টায় স্বপ্ন টপ্পও দেখেছিলাম। কিন্তু হ'ল না কিছুই।

—কেন প্রার্থনার আবার কী হয়েছিল?

—স্বপ্নটা তো আমিই শুধু দেখেছিলাম ওকে নিয়ে। ওকে তো আর স্বপ্ন দেখাতে পারিনি। ও যদি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে না চায়, তবে আমি কী করতে পারি বলুন। আমি স্মাগলার, সমাজ বিরোধী, মতিচ্ছন্ন যুগের ফসল, এসব বলে টলে চলে গেল একদিন। জীবনে কোনও দিনই সুশান্ত ইশোর প্রার্থনার যোগ্য হয়ে উঠতে পারল না। ফেল, ফেল, একদম ডাহা ফেল।'

এই অব্দি বসে সুশান্ত থাম। একটুক্ষণ পর বলল, 'আসলে কী জানেন তো, মেয়েগুলোকে জোর করে ধরে ধরে বিয়ে করে ফেলা উচিৎ। ভালবাসা পাবার যোগ্যই নয় ওরা। ভালবাসাটা বোঝেই না ওরা।... আজ আর ওসব নিয়ে ভাবি না। এই সেদিন দীর্ঘ ন'বছর পর নিউ কোচবিহার স্টেশনে ওর সঙ্গে দেখা। আমি চিনিনি। ও-ই চিনেছে আমায়। আমি চিনব কীভাবে বলুন? সেই প্রার্থনা কোথায়? শুকিয়ে কাঠ! ইতিমধ্যে ওর স্বামী নিত্যানন্দজী ওকে তিনটে ছেলেমেয়ের জননী করেছে। কনগ্রাচুলেশন নিত্যানন্দ। পৃথিবীতে তোমারই শুধু পারবে প্রার্থনাদের টিট করতে। যুগ যুগ জিও নিত্যানন্দ।...তো প্রার্থনা ডেকে বলল, 'আরে সুশান্ত না? কী ব্যাপার?' আমি ওকে ভাল করে দেখে চিনতে পারি, প্রার্থনা। চোখ দুটোয় সেই শয়তানের মতো চাউনিটা আজও আছে, মুছে যায়নি। আমি শব্দহীন হাসি। ও জানতে চাইলো, 'কী, কেমন আছ? চিনতে পারছ না? কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়েই আছ যেন।' আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, 'খারাপ নেই, বেশ ভালই আছি। আর তোমাকে ভুলে যাব?'...

(তিন)

নিউ গিতালদহ বাজারের গগনের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারিতে বসে বসে গল্প করছি। গগনকে ডাক্তার ভেবে নিতে অনেক কষ্ট হয়েছিল প্রথমটায়। অনেক কটা দিন গিয়েছিলাম ওর ডিসপেনসারিতে। ওকে দেখা মাত্র ওকেই আমার রুগি মনে হয়েছিল। তা ছাড়া গগন তো আঠাশ ঊনত্রিশের মাত্র। এই বয়সের একটা ছেলের মানবজীবনের ব্যাধি দূরীকরণের গুরুদায়িত্বটা মাথায় নিয়ে বসতে পারাটা অভাবনীয় এবং নিশ্চয়ই তা কৃতিত্বেরও! ছ'ফুট বাই আট ফুট একটা ছোট ঘুপচি ধরনের সূর্যের আলো ঢুকতে না পারা প্রায় অন্ধকার ভাঙা চোরা ঘরে ওষুধের শিশি। ওর বেশিরভাগ গুলোই খালি ও ধুলাবালিতে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কালো কুচকুচে অপরিচ্ছন্ন খবরের কাগজ টুকরো টুকরো করে কেটে ওষুধের বাক্সের নিচে চাপা দেওয়া। কেউ এসে ওষুধ চাইলে ওই অপরিচ্ছন্ন ধুলাবালিতে মাখামাখি কাগজের টুকরোগুলোতেই ওষুধের পুরিয়া বানায় গগন। টেবিলের এক কোনে একটা তেল চিটচিটে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। কুপি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে উঠে গগনের ডিসপেনসারিটাকে অদ্ভুত এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করে তুলেছে। ওরই মধ্যে গগন তেল চিটচিটে ছুঁতে ঘেন্না করে এমন একটা লুঙ্গি পরে হাতল ভাঙা একটা চেয়ারে বসে আছে একজন নামীদামি দার্শনিকের ভঙ্গিমায়। যেন মানবজীবনের নানান জটিল রোগ ভোগ নিরাময় করে তোলার চিন্তায় ওর মাথাটা ভর্তি হয়ে আছে। ওর

গলায় একটা স্টেথো। ওটার দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে আছে কতকাল! স্টেথোটা কতকালের কে জানে! নির্ঘাৎ দিনহাটার কোনও বাজার জমিয়ে তুলতে না পারা ডাক্তারের পরিত্যক্ত একটা স্টেথোই গগন কোনও প্রকারে জোগাড় করে নিয়ে এসে গলায় ঝুলিয়ে বসেছে।

আমি গগনের কাছে জানতে চাইলাম, 'মানব চিকিৎসা কেমন চলছে গগন? ডিসপেনসারিটা চলছে তো?'

গগন অমায়িক হেসে জবাব দিল, 'খারাপ চলছে না, ভালই তবে এখন তো অফ সিজন। এখন বাজারটা খারাপ, মন্দা। তবে এরকমটা থাকে না। এখানে বসার আগে ভাবতে পারিনি এখানে ডিসপেনসারি দিয়ে বাজারটা ধরে নিতে পারব।'

আমি মনে মনে ভাবি আর অবাক হই। ডাক্তার আর ডিসপেনসারির যা ছিরি, এতে কীভাবে এত ভাল চলতে পারে। তা ছাড়া এখানে এত লোকই বা কোথায়? তবু গগন যখন নিজেই বলছে, তখন নিশ্চয়ই ভাল চলছে। ভাল লাগল গগনকে। লুকোচুরি কিছু নেই। গলা শুকোনো নেই। বেশ খোলামেলা প্রকৃতির ছেলে।

এখন সময় ষোল সতেরর ফ্রক পরা বাড়ন্ত শরীরের একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল গগনের ডিসপেনসারিতে। মেয়েটির চোখেমুখে ভয়, আতঙ্ক। গগনের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আমি না শুনতে পাই মতন করে চাপা গলায় কথা বলছে আর চারদিকে দেখছে। কেউ কেউ দেখেফেলতে পারে, হয়তো সেই ভয়টাই আছে!

গগন বলল, 'তোমার ডেটটা কবে ছিল?' মেয়েটি অস্পষ্ট উচ্চারণে যেন কী বলল। গগন আর কোনও প্রশ্নে গেল না। খুঁজে পেতে একটা ওষুধ মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল, 'রোজ সকালে খালি পেটে তিন ফোঁটা করে তিনদিন।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে তো?' মেয়েটির প্রশ্ন আর্তের মতো শোনায়, 'আর কোনও ভয় থাকবে না তো?'

গগন মেয়েটির চোখে চোখে রাগী পণ্ডিত মশাইয়ের ঢঙে ভারি গলায় বলল, 'এর আগে তো দুবার এসেছিলি।'

—হ্যাঁ, সে তো এসেইছিলাম। তোমার কাছে না এসে যাব কোথায়? বাঁধিয়ে দিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে? তুমি আমাদের জন্য আছো তাই করে খাচ্ছি। এই লাইনটা ছেড়ে দিলে তো আমাদের মরণ!

গগন মেয়েটির প্রশ্নে জবাব না দিয়ে বলল, 'পয়তাল্লিশ টাকা।'

মেয়েটি চমকে উঠে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে গগনের বলা টাকার অঙ্কটা শুনে। মেয়েটির মুখ কালো হয়ে ওঠে। ভোরের পাখির মতো করে শুধোলো, 'অত?'...

(চার)

সেদিন স্টেশনে এসেছিল মনীশ। ট্রেন লেট তাই বসে বসে আমার সঙ্গে গল্প করছিল। ও-ই বলেছে, 'গগন ডাক্তার ফাক্তারি কিছু করে না। ও ডাক্তার সেজে বসে থাকে। স্মাগলাররা অ্যাকশানে নামার আগে ওর কাছে যায়। পুলিশ এবং বি.এস.এফের গতিবিধি গগন সংগ্রহ করে রাখে। রাজ্যের গোপন খবর ওর কাছে থাকে। বলতে পারেন গগনের একটা গোপন সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র।

আমি চটপট জানতে চাই, 'এসবে গগনের লাভ?'

—পার ইনফর্মেশনে ওর কামাই আছে।

আমার কপালে রাজ্যের চিন্তার জটিল রেখা ভেসে ওঠে। আমি আয়নায় না বসেও যেন নিজের চোখ মুখের আদলটা দেখতে পেয়ে যাই। মনীশকে সেদিনের ঘটনাটা বললাম। বললাম, 'তুমি গগন সম্পর্কে এসব বলছে, কিন্তু সেদিনই তো আমি দেখলাম একটা মেয়ে ওর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেল। তা হলে সেটা কী?'

—আরে একটা দোকানে ভ্যারাইটিজ জিনিস থাকে । থাকে না?

—গগনের তো ওষুধের দোকান। চিকিৎসা করে পয়সা পায়। সেখানে অন্য জিনিসপত্র থাকবে কেন?

—সেদিন কে গিয়েছিল গগনের ওষুধ নিতে? কুসুম?

—কুসুম? আমি তো ওই মেয়েটির নাম ধাম জানি না।

—ওই তো কুসুমরাই যায় গগনের কাছে। খালাস হবার ওষুধটা গগন ভাল দেয়। ওর ওই ওষুধটায় ভেজাল থাকে না।

মনীশ এসব কী যা-তা বলছে? খালাস করিয়ে নেবার ওষুধ? আমি সবটুকু বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। মনে মনে ভাবি, মানুষ চিনি বলতে যে একটা গোপন অহংকার আমার মধ্যে ছিল সেটা মিথ্যা, ভুল দেখছি। গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখি। না গগনকে তেমন ঘুঘু ছেলে ভেবে ওঠা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে শূন্যে দৃষ্টি বাড়িয়ে বসে থাকি। মনীশ আমাকে ফেরাতে বলল, 'যাক, কেসব বাদ দিন। এখানকার গল্প অফুরন্ত। শেষ হবার নয়। সব গল্প আপনার বিশ্বাসও হতে চাইবো। কিন্তু এটাও ঠিক সব ঘটনা শুধুই গল্প নয়।'

আমি পাল্টা প্রশ্ন রাখি, 'কিন্তু আমি তো সেদিন নিজের চোখে দেখলাম, গগনের কাছে রুগি গেল, এর আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছি। গগনের ওষুধ নিয়ে এরা বাড়ি ফিরে গেছে। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কী করে বলোতো মনীষ? আমার নিজের চোখে দেখা রোজকার ঘটনাটাও তুমি মিথ্যে কিংবা ভুল বলবে?'

—না, আপনি যা দেখেছেন তাও ঠিক। আবার আমি যেটা বললাম, সেটাও ঠিক। জানেন তো এটা বর্ডার এলাকা। রাতের অন্ধকারে অনাচার চলে এখানে। মানে রাতভরই বলতে পারেন। এই জায়গাটাকে বৃন্দাবনও বলতে পারেন। মেয়ে স্মাগলিং চলে এখানে। এপার ওপার দু'দেশের মেয়েরাই সেজেগুজে চলে আসে। টাকা চাই, টাকা। এই করেই ওদের পেট চলে। শরীর বেচাটাই ওদের জীবিকা। বুঝলেন তো মাস্টারবাবু? তবে গগন ওদের রক্ষাকর্তা। গগন বাহাত্তরের গ্র্যাজুয়েট। পরীক্ষা দিতেও যায়নি। ওর হয়ে বন্ধুদের কেউ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে! গগন পাশ করে গেল। তা সেই গ্রাজুয়েট গগনকে চাকরি কে দেবে? গগনের তো দেখেছেন ওই শরীরের

হাল। ওয়াগান ভাঙতে পারবে না। পুলিশের ডাণ্ডা খাবার শক্তিটাও নেই ওর শরীরে। তা হলে কী করে বাঁচবে? দিনহাটা ছেড়ে এখানে এসে ডিসপেনসারি দিয়ে বসেছে। অন্য কোনও রোগের ওষুধ নয়। শুধু ও জানে খালাস করানো ওষুধটাই। আর ওর সঙ্গে স্মাগলারদের ইনফরমেশন জোগানো। এটাই ওর জীবিকা। এর উপর দাঁড়িয়ে ওদের দিনহাটার সংসারটা চলছে। গগনের কার্যকলাপও এক ধরনের জনসেবামূলকই। গগন না থাকলে এখানে খুব অল্প সময়েই জনবসতিতে গিজ গিজ করত। দেখতেন নিউ গিতালদহটাই হতো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। সুতরাং গগন রায় এখানকার এইসব করে খাওয়া মানুষদের ত্রাণকর্তা। এ কথা ঠিক। এতে করে গগন ভাল আছে...।

স্টেশনে বসে এইসব নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল মনীশের সঙ্গে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্লাটফর্মের মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম ওকে নিয়ে। মনীষ বলল, 'ওই দেখুন ধরলা নদীর ওপর রেল ব্রিজ। আগে ওই নদীটার ওপর দিয়ে রেল চলত। ওপারে বাংলাদেশের মোগহহাট স্টেশন। রোজ শয়ে শয়ে মানুষজন ওই রেল সেতুর ওপর দিয়ে চলাচল করে। বি. এস. এফের জাওয়ানরা আটকায় না। ওরা হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে কিছু গুঁজে দিলেই ওরা দার্শনিকের ঢং করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।!'...

সন্ধ্যে নেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। আমরা কেউই ওদিকে খেয়াল করিনি। মনীশ তাড়া লাগাল। বলল, 'চলুন, এবারে ফেরা যাক।' ট্রেনের তো এখনও খবরই হ'ল না। এই লাইটার আর উন্নতি হবে না কোনদিনই। অবহেলিতই থেকে যাবে। কেউ দেখে না কেউ ভাবে না আমাদের কথাটা। ওদিকে আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করে থাকবে।'...

আমার মনে পড়ে মনীশ নিউ গিতালদহ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। ওর জীবনে উপচে পড়া সময়। স্কুল আছে, ছাত্র নেই। ওর স্কুলে যাওয়া তো সইটা করতেই। তো ও-ও সময়টা নষ্ট করে না। কাটা কাপড়ের ব্যবসাটা হয়তো খারাপ চলছে না। সন্ধ্যার পর রাতভর নিউ গিতালদহ স্টেশন এলাকায় যেসব কাণ্ডকারখানা নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেসবের মধ্যে মনীশ নেই। থাকে না। সন্ধ্যার পর ড়িউ গিতালদহের ছেলেমেয়েদের নিয় ও নাটকের রিহার্সাল দেওয়ায়। ও নিজেই নাটক লেখে, নিজেরই নির্দেশনায় নাটক মঞ্চস্থ হয়। আমি ওর লেখা নাটকের স্ক্রিপ্ট দু-একটা পড়েওছি। স্মাগলার আর কুসুম - গগনদের জীবনের নানান সমস্যার গল্প। কেন এইসব ছেলেদের এই পথে নামতে হয়েছে, সরকার এবং সমাজ কতটুকু দায়ী ওদের জীবনের বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য। অবহেলিত হতে হতে তো দেয়ালে ওদের পিঠ ঠেকে গেছে। এরই মধ্যে হাসি - কান্না, প্রেম - ভালবাসা, বিচ্ছেদ-প্রার্থনা কখনো সখনো এসেই যায়! সবই দেখিয়েছে মনীশ—

ফিরে আসতে আসতে বললাম, 'তুমি তো বেশ মানুষ হে মনীশ! কতগুলো উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক কর! উদ্দেশ্যটা যদিও খুবই ভাল—'

মনীশ বলল, 'আর কিছু নয়, এই সব ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে দু-একটা করে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে পারলেই ওরা আলো এবং অন্ধকার দুটো জিনিসই নিজেদের দু'চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারবে!'...

(পাঁচ)

গিতালদহের শীতের সন্ধ্যায় সাতটা সাড়ে সাতটা অনেকটা রাতই। দোকানপাটের সব ঝাঁপ পড়ে গেছে। বাড়ির লোকজন এখন বিছানায় উঠে গেছে। যারা বাইরে থাকার তারা বাইরেই মদ, মেয়েছেলে আর জুয়া খেলার উন্মত্ততা নিয়ে। একটা ভাঙাচোরারা চায়ের দোকানে কুপি জ্বালিয়ে মনীশের লেখা এবং নির্দেশনায় অনুষ্ঠিতব্য নাটকের জোর রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। সামনের কালীপুজোয় গিতালদহ বাজারের রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটা দেখা যাবে।

অশোক প্রিয়দর্শী, গগন, সুশান্ত, কুসুম এবং গিতালদহের অন্যান্যরা এখন কেউ বর্ডারের ছেলেমেয়ে নয়। ওরা এখন প্রত্যেকেই মনীষের নাটকের এক একটি সার্থক চরিত্র।...

(ছয়)

আমাদের দেখে অশোক অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার মাস্টারবাবু, আজ সন্ধ্যা লাগতেই চলে এলেন যে? শরীর খারাপ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, সেরকমই। সারারাত তো স্টেশনে ঘুম হয় না। রাতে তো মাত্র দুটোই ট্রেন। টেবিলে শুয়ে টেনে ঘুমোতে পারি। কিন্তু হয় না। রাতভর একটা মেয়ের পিছনে দু-তিনজন দৌড়লে চিৎকার চেঁচামেচি' কান্নাকাটি তো হবেই। সারা রাত ওয়েটিং হল আর প্ল্যাটফর্মে এইসব নিয়ে যুদ্ধ। দরজা খুলে বাইরে বেরুতে পারি না। ভয় হয়, বাইরে বেরোলেই ওদের হাতে খুন হয়ে যাব।'

অশোক বলল, 'ছেলেগুলো আগে এমনটা ছিল না। ঘরে বাইরে ওরা ভালবাসাহীন। খবরের কাগজে তো রোজই পড়ছেন, সেই কতকাল যাবৎ এদিকের মানুষজন অবহেলিত। এদের কথা কেউ ভাবে? এদিককার উন্নয়নের কথাটা? কেউ না! তো মার খেতে খেতে এদের পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে। খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার। মানে, এদের সার্বিক উন্নয়নের কথাটাই বলছি। তা না হ'লে দেখবেন গগন, সুশান্ত আর কুসুমরা গোটা অঞ্চলের দল নিয়ে নেবে। বলবে, নিউ গিতালদহটা শুধু আমাদেরই!'...

আমি ভাতের থালা সামনে নিয়ে অশোক কী বলতে চাইছে সেটা বুঝে নেবার চেষ্টা করি। আমার মধ্যে উপলব্ধ হয়, অশোক ভয়ঙ্কর একটা কথাই বলে দিল।

আমি মাথা নেড়ে সংক্ষেপে শুধু বললাম, হ্যাঁ, সেটাই। ভালবাসাহীন হয়ে গেলে তো মানুষ স্বাভাবিক কারণেই হিংস্র হয়ে উঠবে। ভালবাসা এবং নির্ভরতাটা পেতে আলাদা ভাবনা চিন্তায় ভাসা শুরু করবে। বলবে, এই জায়গাটা আমাদের, ওই জায়গাটা তোমাদের।... সে ক্ষেত্রে সেই সব মানুষের তো দুটোই রাস্তা খোলা থাকে। মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকার পথটা যে করেই হোক খুঁজে বের করা!'...